কুসুমে কুসুমে গণিত-চিহ্ন

বি মা ন না থ

'ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্ শুনে লাগে খটকা; ফুল ফোটে তাই বলো, আমি ভাবি পট্‌কা!'

আমরা এটাকে সামান্য একটা মজার ছড়া বলে ধরে নিই, কারণ ব্যাপারটা তো আজগুবি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা বড় প্রশ্নকেও কিন্তু তার ফলে আমরা সাধারণত এড়িয়ে যাই। প্রশ্নটা হল, ফুল ফোটে কীভাবে? ফুলের কলি থেকে পাপড়িগুলো কীভাবে বেরিয়ে আসে?

কবিরা ভাববেন, এই হল বিজ্ঞানীদের নিয়ে ঝামেলা। ফুলের সৌন্দর্য রয়েছে উপভোগ করার জন্য; এর মধ্যে বিজ্ঞানের ঝামেলা নিয়ে আসা কেন? ফুল ফোটা নিয়ে নিজেকে বিজ্ঞানের হুল ফোটানোর কী দরকার?

কিন্তু বিজ্ঞানীদের থামায় কে? জগদীশচন্দ্র বসু লজ্জাবতী পাতার মধ্যে বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বের সন্ধান করেছিলেন। গাছের সংবেদনশীলতার জন্য এবং গাছপালার বড় হওয়ার পিছনে পদার্থবিজ্ঞানের কোন সূত্রগুলো দায়ী, তার খোঁজ করেছিলেন তিনি। সেই রকম সম্প্রতি একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর গবেষণার দৌলতে ফুল কেমন করে ফোটে এই প্রশ্নটার আংশিক হলেও একটা উত্তর পাওয়া গেছে। তিনি হলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্মীনারায়ণ মহাদেবন।

না, তিনি ফুল ফোটার আওয়াজ নিয়ে গবেষণা করেননি। ফুল ফোটার শব্দ আদৌ পটকার মতো কি না সেটা এখনও জানা যায়নি। তাঁর গবেষণার লক্ষ্য ছিল ফুলের পাপড়ি কী করে ধীরে ধীরে বড় হয় সেটা খতিয়ে দেখা। কেমন করে ফুলের কলির ঘেরাটোপ থেকে পাপড়িগুলো বেরিয়ে আসে, তার বিশদ প্রক্রিয়াটি বুঝতে চেষ্টা করা।

মজার কথা এই যে, মহাদেবনের গবেষণা শুধু ফুল ফোটার কায়দা-কানুন নয়, প্রাণিজগতে অন্য কয়েকটা বিষয়ের ওপরও আলোকপাত করেছে। যেমন, অনেক গাছের পাতা ঢেউ খেলানো হয়—তেমনটা হয় কেন? বা আমাদের পেটের নাড়িভুঁড়ি কীভাবে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে ইত্যাদি। একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর হল এইরকম: পাপড়ির বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধির হার সমান নয়, যার ফলে তার পরিধি ঢেউ খেলানো আকার পায়। সেই একই কারণে

লিলিয়াম কাসা-ব্লাঙ্কা

ফুলের কলির পাপড়িগুলো একে অপরের থেকে ছিঁড়ে আসে আর বহির্মুখী হয়, যাকে আমরা ফুল ফোটা বলি। দেখা গেছে যে, ফুল ফোটা আর পাতার বড় হওয়ার মধ্যে একটা গভীর সাদৃশ্য রয়েছে।

যদি কোনও কবি বা সাহিত্যিক ভুল করে এই প্রবন্ধটা পড়তে পড়তে এই পর্যন্ত পৌঁছে থাকেন, তাহলে হয়তো তাঁরা গবেষণার ফলের কথা শুনে মুচকি হাসবেন। কারও হয়তো মনে পড়তে পারে অষ্টাদশ শতাব্দিতে জার্মান সাহিত্যিক-দার্শনিক গ্যেটেও ফুল ফোটা নিয়ে প্রায় একই কথা ভেবেছিলেন। তাঁর ১৭৯০ সালে লেখা 'উদ্ভিদের রূপান্তর' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, ফুলের পাপড়ি আর গাছের পাতার গঠন একই ধরনের, কারণ তারা একই মূল সূত্র থেকে উদ্ভূত। কিন্তু এর কোনও পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ অবশ্য তিনি দেননি। হয়তো তখন সম্ভবও ছিল না।

দর্শন ছেড়ে বিজ্ঞানের জগতে ফিরে যাই। ফুল ফোটার প্রক্রিয়া বুঝতে যাওয়ার আগে প্রথমে ফুলের পাপড়ি এবং পাতার গঠন সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যাক। অনেক গাছের পাতা, বিশেষ করে যেসব পাতা

ফুলের ঘুম কীভাবে ভাঙে তা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে জীবদেহের জিন-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পদার্থের অন্তর্নিহিত ধর্মের বিবাহের উপাখ্যান।

একটু লম্বাটে হয়, যেমন আমপাতা, এরা কিশলয় অবস্থা থেকে ক্রমশ যত বড় হয়, ধীরে ধীরে একটা ঢেউ খেলানো আকার পায়। এবং এমন কিছু ফুল রয়েছে যার পাপড়ির মাথার দিকটা ঢেউ খেলানো হয়, যেমন জবাফুল।

মহাদেবন এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রথমে একটা লম্বা ঢেউ খেলানো পাতার গঠন এবং তার বৃদ্ধি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। বেশ কিছু জলজ উদ্ভিদের পাতা লম্বা হয়। কারণ, পাতা লম্বা হলে জলের গতিকে রুদ্ধ না করেও টিকে থাকা যায়, না হলে সেটা জলের স্রোতে ছিঁড়ে যেতে পারে। জলে বড় হওয়া গাছের পাতা তাই সাপের মতো লম্বাটে হয়। বিজ্ঞানীরা এক ধরনের জলজ গুল্মের (kelp) পাতার ক্ষেত্রে লক্ষ করেন যে, তার আকার, বিশেষ করে পাতাটার ঢেউ খেলানো আকার নির্ভর করে জলের স্রোতের ওপর। যখন জলের স্রোত বেশি থাকে তখন পাতার গঠন হয় সরু, লম্বা এবং সোজা; এই ক্ষেত্রে পাতার মধ্যে কোনও কোঁচকানো অংশ থাকে না। সেই একই গাছকে কম স্রোতের জলে রাখলে (যেমন পুকুরে বা হ্রদের তীরের দিকে), তখন তার আদলটাই বদলে যায়। তখন সেটা প্রস্থে খানিকটা বেড়ে যায়, আর তার মধ্যে একটা ঢেউ খেলানো আকার আসে।

তাঁরা এর এইরকম ব্যাখ্যা করলেন: পাতার লক্ষ্য কীভাবে সালোকসংশ্লেষের জন্য তার ওপর পড়া আলোর পরিমাণ বাড়িয়ে বেশি খাবার তৈরি করা যায়। এর জন্য পাতার ক্ষেত্রফল বাড়ালে সুবিধে হয়। আবার এটাও দেখতে হবে যাতে বড় আকারের হতে গিয়ে শেষে জলের স্রোতে পাতাটাই না ছিঁড়ে যায়। তাই জলের স্রোত বেশি হলে লম্বায় বড় হওয়াটাই প্রশস্ত। জলের স্রোতই পাতাটিকে দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত করে রাখবে, ফলে তার খাবার বানানোর জন্য আলো পাবে গোটা পাতাটাই। কিন্তু স্রোত কম হলে সেরকম প্রসারিত থাকার সুবিধে বিশেষ পাওয়া যায় না। তাই পাতাটা তখন প্রস্থের দিকে বড় হওয়ার চেষ্টা করে। পাতার দৈর্ঘ্য বরাবর বড় না হয়ে, পাতার ধার দিয়ে বড় হয়। এর ফলে পাতাটা খানিকটা কুঁচকে যায় এবং তার ধারগুলো ঢেউ খেলানো আকার পায়। অবশ্য পাতার তো আর চিন্তা করার ক্ষমতা নেই, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য গাছ আপনা থেকেই তার পাতার বৃদ্ধির হার বদলে নেয়। এই পরীক্ষা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পাতার ঢেউ খেলানো আকারের সঙ্গে তার বৃদ্ধির হারের একটা সম্পর্ক আছে।

এই সম্পর্কটা আর-একটু খতিয়ে দেখার জন্য বিজ্ঞানীরা যখন একটা লম্বা পাতাকে তার দৈর্ঘ্য বরাবর ফালি করে কাটলেন, তখন দেখা গেল সেই লম্বা টুকরোগুলো আর আগের মতো কুঁচকে নেই। আলাদাভাবে তাদের জ্যামিতি সমতল, কিন্তু একটার সঙ্গে অন্যটা জোড়া লাগালে সেটা আর সমতলের মতো থাকছে না, খানিকটা কুঁচকে যাচ্ছে। অর্থাৎ, এই কোঁচকানোর কারণ হল একটা ফালি অন্য ফালির ওপর চাপ দিয়ে তাকে বিকৃত করছে। এই ধরনের চাপকে পদার্থবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যার ভাষায় বলা হয় পীড়ন বা স্ট্রেস। প্রশ্ন হল এই পীড়নের উৎপত্তি কোথায়? পাতার একটা অংশ খামোখা অন্য অংশের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে যাবে কেন?

একটা ফুলের পাপড়িকে ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যাবে তার মধ্যিখান দিয়ে একটা মোটা শিরা চলে গেছে, যার থেকে উপশিরা বেরিয়ে সমস্ত পাপড়িতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই শিরা-উপশিরাগুলো পাপড়ির বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করে। ফুল ফোটার আগে, কলির অন্দরমহলে থাকাকালীন পাপড়িগুলোর ভাঁজটা বাইরের দিকে উল্টে যায়। গণিতের ভাষায় পাপড়ির বক্রতা ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক হয়ে যায়। ধনাত্মক বক্রতার উদাহরণ হল কোনও একটা বলের ওপরের অংশ, ঋণাত্মক বক্রতার উদাহরণ হল ঘোড়ার জিনের মতো আকার। দুটো আকার একেবারে অন্য রকম। তাই এক ধরনের আকার থেকে অন্যটাতে রূপান্তরিত করার পিছনে নিশ্চয় কোনও বিশেষ কারণ রয়েছে। এখানেই আমাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

ফুলের পাপড়ির বক্রতা কলির ভেতর একরকম (ডানদিকে, ধনাত্মক), ফুল ফোটার পর আর-একরকম (বাঁদিকে, ঋণাত্মক)

আগে মনে করা হত, পাপড়ির মধ্যিখানের শিরা বরাবর পাপড়ির বৃদ্ধির হার বেশি হয়। অন্যান্য অংশের তুলনায় পাপড়ির মাঝখানটা খুব বেশি বড় হতে থাকে। এই ভাবে অসমান ভাবে বড় হতে হতে এক সময় সেটা বেঢপ আকারের হয়ে যায়। এবং এক সময় পাপড়িগুলো উল্টে যায়, অর্থাৎ কলির ভেতর থেকে বাইরের দিকে খুলে যায়। এই ভাবেই ফুল ফোটে—এই রকমটাই ছিল প্রচলিত ধারণা। মহাদেবনের গবেষণায় দেখা গেছে যে, এরকমটা ঘটছে না।

আর-একটা ধারণা ছিল যে, হয়তো পাপড়ির ভেতরের অংশের চেয়ে বাইরের অংশ, অর্থাৎ অন্য পিঠের অংশে খুব বেশি বৃদ্ধি হয়। ফলে পাপড়ির বুক আর পিঠের মধ্যে একটা চাপ সৃষ্টি হওয়ায় পাপড়িটা ধনুকের মতো বেঁকে যায়।

ধরা যাক উলের কাঁটা দিয়ে একটা উলের টুপি বোনা হচ্ছে। টুপির মধ্যিখানের অংশ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বাইরের অংশ বোনা হচ্ছে। এবারে বাইরের দিকে বোনার সময় বেশি করে উল দিতে হবে। কারণ ব্যাসের সঙ্গে পরিধিটা বাড়ছে। কিন্তু যদি সমতল জ্যামিতির এই সহজ নিয়ম মেনে বাইরের অংশে উলের পরিমাণ বাড়ানো হয়, তাহলে সেটা শেষপর্যন্ত টুপি হবে না, দাঁড়াবে একটা গোল টেবিলক্লথ বা তেমন কিছু। টুপি বানাতে গেলে মধ্যিখানের অংশটাকে ফোলাতে হবে। তার জন্য পরিধির অংশ বাড়াতে হবে ঠিকই, কিন্তু সমতল জ্যামিতি যতটা বৃদ্ধি দাবি করে, তার তুলনায় খানিকটা কম পরিমাণে। তখন ভেতরের দিকে একটা চাপ পড়বে, যার জন্য মধ্যিখানটা ফুলে উঠতে বাধ্য। শুধুমাত্র জ্যামিতির নিয়মেই এমনটা হয়। তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে, বাইরের দিকের অংশে প্রয়োজনের চেয়ে কম পরিমাণে বৃদ্ধি হলে সেটা ভেতরের অংশের ওপর এক ধরনের চাপ দেয়। এই চাপ বা পীড়নের ফলে ভেতরের অংশটাও ফুলে যায়।

আলুর চিপ্‌স ভাজার সময়েও সেই রকমই, কিন্তু উল্টো ক্রমে একটা ব্যাপার ঘটে। গরম তেলে পড়ার পর প্রথমেই আলুর ভেতরের জল বাষ্পীভূত হয়ে বুদ্‌বুদ্‌ তৈরি করে, যার জন্য আমরা আলু ভাজার পরিচিত শব্দটা পাই (কারণ, সেই হাওয়া ভর্তি বুদ্‌বুদ্‌গুলো প্রতি মুহূর্তে ফাটতে থাকে)। যেহেতু বাইরের অংশের (অর্থাৎ গোল চিপ্‌সের পরিধি বরাবর) ক্ষেত্রফল বেশি, সেখান থেকে জলের বাষ্পীভবনের পরিমাণও বেশি। সেই অংশটা তাই খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় (যার অর্থ হল ওই অংশটা ভাজা হয়)। শুকিয়ে গিয়ে সেই অংশটা পরিসরে ছোট হয়ে যায়, কারণ আলুর একটা বড় অংশ তো জল, সেটা কমে গেলে আয়তনও কমে যাবে। বাইরের দিকের অংশটা এমন করে ছোট হওয়ার ফলে ভেতরের অংশে একটা চাপ পড়ে। যার ফলে জ্যামিতি যায় বদলে। একই রকম ব্যাপার হয় মাইক্রোওয়েভে পাঁপড় গরম করতে গেলে। তার বাইরের দিক থেকে জল উবে গিয়ে ছোট হয়ে যায়, আর তখন পাঁপড়টা দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

হয়তো মনে হচ্ছে কোথায় পাঁপড় আর কোথায় পাপড়ি! তবে, উদাহরণটা মোটেই অবান্তর নয়। এখানে যদি বাইরের অংশটা কমে না গিয়ে বরং বেড়ে যেত, তাহলে বলের মতো দুমড়ে না গিয়ে ঘোড়ার জিনের মতো খুলে যেত। শুধু তাই নয়, বাইরের অংশটা বেঢপ করে বাড়ালে সেখানে একটা ঢেউ খেলানো প্যাটার্নও তৈরি হত।

উলের টুপি বানানোর সময় যখন বাইরের দিকটাতে উলের পরিমাণ বেশি করে বোনা হয়, তখন তার পরিধিতে একটা ঢেউ খেলানো আকার নেয়। অনেক সময় মায়েরা বাচ্চাদের টুপির জন্য এই রকম কুঁচি-করা প্যাটার্ন বুনে থাকেন এবং তার জন্য দরকার বেশি করে উল দিয়ে বোনা। উল ছাড়াও অনেক সময় লেস্-এর কাজেও এই রকম কোঁচকানো প্যাটার্ন তৈরি করা হয়।

তাহলে কি ফুলের পাপড়ি আর লম্বা পাতার ক্ষেত্রেও এমনটা হচ্ছে? সেখানেও কি পাপড়ি বা পাতার বাইরের অংশ বেঢপ আকারে বেড়ে যাচ্ছে, যার জন্য তার বক্রতা ঘোড়ার জিনের মতো আকার নিচ্ছে, আর তার ধার দিয়ে ঢেউ খেলানো প্যাটার্ন তৈরি হচ্ছে?

এই প্রকল্পটা হাতেনাতে যাচাই করতে মহাদেবন এবং তাঁর সহকর্মীরা এক ধরনের সাদা লিলিফুলের (*Lilium casablanca*) পাপড়ি নেন। এই ফুলের কলির ভেতরে তিনটে ছোট পাপড়ি রয়েছে, যাকে ঘিরে আরও তিনটি পাপড়ি (যেগুলো হল বৃতির অংশ) পুরো কলিটাকে আবদ্ধ করে রাখে। ফুলটা ফুটে উঠতে প্রায় সাড়ে চার দিন সময় নেয়। প্রথম চার দিন ধরে প্রায় দশ সেন্টিমিটার লম্বা কলিটা দৈর্ঘ্যে এবং পরিধিতে বড় হয়। এর জন্য কলির প্রায় ২০০ মিলিলিটার জল দরকার হয়, যেটা সে শুষে নেয়। এই পর্যায়ের শেষে কলিটার মুখ যদিও বন্ধ থাকে, তার অবস্থা হয় একটা টেনে রাখা ধনুকের ছিলার মতো। যেন যে-কোনও মুহূর্তে ছিটকে বেরিয়ে আসার জন্য সেটা তৈরি।

ঠিক এই সময় পাপড়িগুলোকে খুলে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, ভেতরের পাপড়িগুলোর ধার দিয়ে ঢেউ খেলানো প্যাটার্ন রয়েছে, যদিও বাইরের দিকের তিনটে পাপড়ির মধ্যে সেরকম কিছু নেই। এর পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাপড়িগুলো বড় হয়ে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছয়, যখন ভেতরের আর বাইরের পাপড়িগুলোর মধ্যে মেলবন্ধন ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কবিতার ভাষায়: 'অমনি যেন পূর্ণপ্রাণের/ মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।/ যে পারে সে আপনি পারে,/ পারে সে ফুল ফোটাতে।' ঠিক তখন ধনুকের ছিঁড়ে যাওয়ার মতো পাপড়িগুলোর বক্রতা আমূল পরিবর্তিত হয়ে বাইরের দিকে ছিটকে পড়তে শুরু করে। কে জানে হয়তো ওই সময় কোনও সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে কান পাতলে 'ঠাস্ ঠাস্' শব্দ শুনলেও শোনা যেতে পারে!

পাপড়ির বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধির হার মাপার জন্য বিজ্ঞানীরা তার ওপর কালো কালি দিয়ে সমান দূরত্বে পর পর কয়েকটি বিন্দু এঁকে দেন, কয়েকটা তার মধ্যশিরার ওপর এবং

স্থির জলে ভাসমান পাতার গড়ন

কয়েকটা তার ধার দিয়ে। যখন পাপড়িগুলো বড় হতে থাকে, তখন এই বিন্দুগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যাবে। মহাদেবন লক্ষ করলেন, পাপড়ির ধার দিয়ে আঁকা বিন্দুগুলো মাঝখানের বিন্দুগুলোর থেকে বেশি তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে। অর্থাৎ পাপড়িগুলোর মধ্যিখানের শিরা বেয়ে নয়, তার বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি পাপড়ির বাইরের দিকে। আর সেই জন্য পাপড়িটা সেই দিকে কুঁচকে যাচ্ছে। যেমন উলের কাঠি নিয়ে বুনতে বুনতে ঢেউ খেলানো প্যাটার্ন তোলার জন্য ইচ্ছে করে বেশি পরিমাণে উল দেওয়া হয় বাইরের দিকে, ঠিক সেই রকম।

শুধু এই পরীক্ষা করেই ক্ষান্ত হননি বিজ্ঞানীরা। পাপড়িটার বিভিন্ন অংশের অসমান বৃদ্ধির জন্য তার বক্রতা কীভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়, এবং বাইরের দিকে ঢেউ খেলানো আকার পায়, সেটা গণিত এবং জ্যামিতির ভাষায় বোঝার চেষ্টা করেছেন। মহাদেবন এককালে চেন্নাই আইআইটি-তে প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করেছিলেন এবং বর্তমানে তিনি হার্ভার্ডের প্রাণিবিজ্ঞানের বিভাগ ছাড়াও ফলিত গণিত বিভাগেরও অধ্যাপক। এই অঙ্কের ফলও তাঁদের অনুমানকে সত্য প্রমাণ করল— কোনও পাতলা ফালির মতো জিনিসের বাইরের দিকে বৃদ্ধির হার বেশি হলে সেটা ধীরে ধীরে বেঁকে যাবে। এবং এও জানা গেল, কেমন ধরনের চাপ পড়লে (অর্থাৎ মাঝখানের আর বাইরের দিকের বৃদ্ধির হার কতটুকু অসমান হলে)

ধীরে ধীরে ফুল ফুটছে

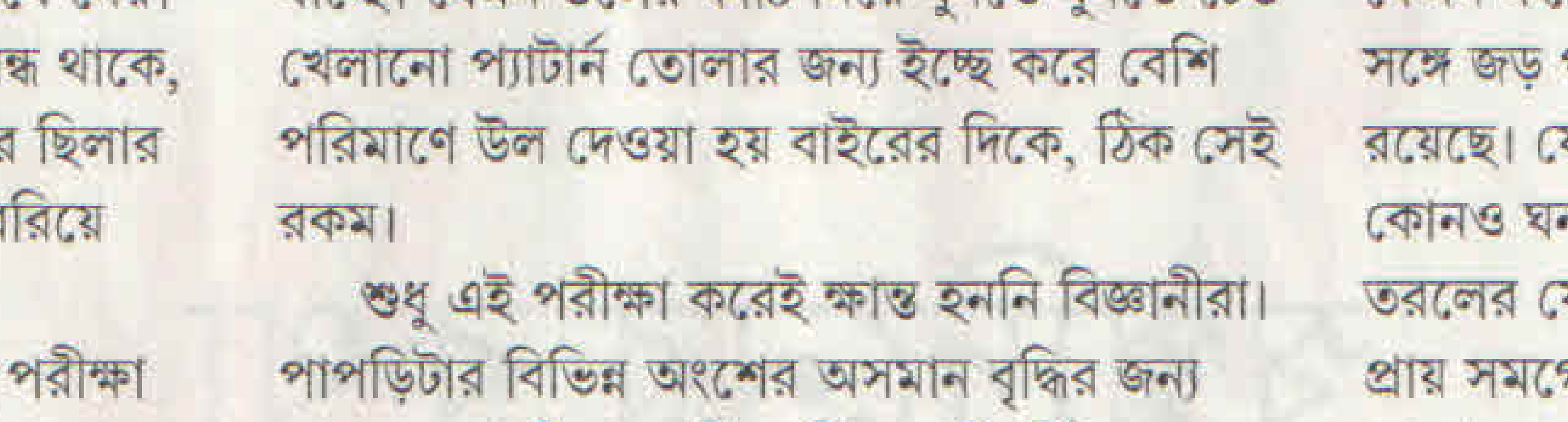

কোন ধরনের পাপড়ি কত তাড়াতাড়ি ফুটে উঠবে। এইসব বিষয় এখন সহজেই পরীক্ষা করে নেওয়া যাবে, এবং বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ফুল ফোটার হার মেপে এই তত্ত্বের যাথার্থ্য নির্ধারণ করতে পারবেন। অবশ্য এই অসমান হার বজায় রাখার জন্য রাসায়নিক স্তরে কী হচ্ছে বা কোষের ভেতরে কোন জিন-এর জন্য এমনটা ঘটে, সেটা এখনও অজানা রয়ে গেছে। তবে প্রাণিজগতের ঘটনার সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের বা গণিতের যোগসূত্রগুলো যে আজকাল ক্রমশ প্রতীয়মান হয়ে উঠছে, এই গবেষণা তারই একটা উদাহরণ। এই গবেষণা এটাই প্রমাণ করে যে, প্রাণিজগতের সব ধরনের ঘটনার পিছনেই যে জিনের প্রভাবকে টেনে আনতে হবে, তেমন কোনও কথা নেই। পদার্থের বৈশিষ্ট্যও প্রাণিজগতের বিভিন্ন জিনিসের আকার এবং তার পরিবর্তন বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এই ধরনের কথা অবশ্য এই প্রথম নয়, গত শতাব্দির গোড়ার দিকে স্কটল্যান্ডের এক বিজ্ঞানী ডার্সি ওয়েন্টওয়ার্থ থম্পসন বলেছিলেন, প্রাণিজগতের অনেক ব্যাপারে গণিত এবং পদার্থবিদ্যার সূত্র লুকিয়ে আছে। তাঁর লেখা 'অন গ্রোথ অ্যান্ড ফর্ম' নামে বইতে তাঁর ধারণার অনেক উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন কেমন করে প্রাণিজগতের আকার বা ফর্ম-এর সঙ্গে জড় পদার্থের দুনিয়ার অনেক ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন, জেলি মাছের আকার, আর কোনও ঘন তরল পদার্থের মধ্যে অন্য একটা তরলের ফোঁটা পড়লে সেটা যে আকার নেয় তারা প্রায় সমগোত্রীয়। তিনি বলেছিলেন, বিভিন্ন প্রাণীর আকারের পার্থক্য বা সাদৃশ্য বোঝাতে অনেক সময় গণিতের ভাষার সাহায্য নিলে সুবিধে হয়।

কবি বা দার্শনিকেরা হয়তো বলবেন, থাকলই বা অঙ্কের সঙ্গে প্রাণিজগতের একটা গূঢ় সম্পর্ক, তা জানলে কি তার সৌন্দর্য আরও বাড়বে, নাকি এই রসকষহীন ফর্মুলা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মেজাজটাই মাটি করা হল? কিন্তু গণিতের জগতেও যে এক ধরনের সৌন্দর্য আছে, সে কথাটা ফেলনা নয়। অনেক বিজ্ঞানীই গাণিতিক সত্যের মধ্যে এক ধরনের সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন। আইনস্টাইন তো গাণিতিক সৌন্দর্যকেই অনেক সময় তাঁর গবেষণার ধ্রুবতারা মেনে চলেছেন। হোক সেটা অন্য ধরনের সৌন্দর্য, যেটার আস্বাদ নিতে খানিকটা কসরত করতে হয়। তবুও সেই সৌন্দর্য আস্বাদনের মধ্যে এক ধরনের আনন্দ নিশ্চয়ই আছে। তাই ফুল ফোটা আর পাতার গঠন নিয়ে এমন গবেষণা আমাদের সৌন্দর্য উপভোগ করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় বই কমায় না বলেই মনে হয়। দে